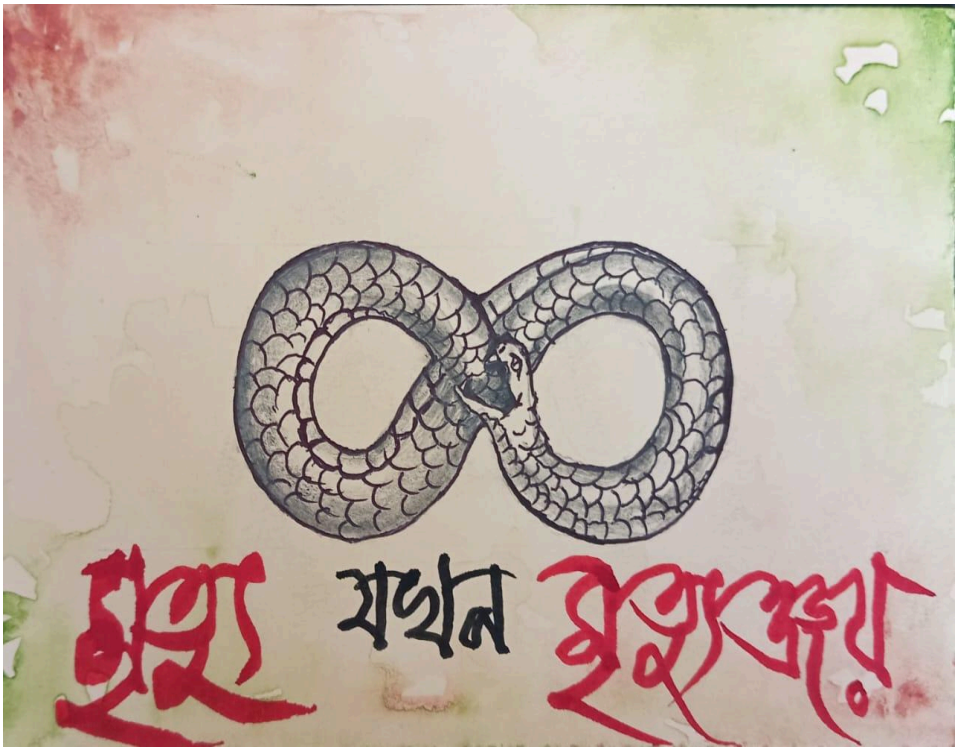

অভিজ্ঞান পাণিগ্রাহী

“কত ফুল নিয়ে আসে বসন্ত
আগে পড়িত না নয়নে,
তখন কেবল ব্যস্ত ছিলেম চয়নে। ”

বসন্ত চিরকাল নানা ফুলের আবিরে নিজেকে রাঙিয়ে তোলে কিন্তু মানব চক্ষু চিরদিনই একক ফুলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে। কারোর কাছে বসন্ত হয়ে ওঠে রক্ত কাঞ্চনের মতো রক্তিম আবার কারোর কাছে বসন্তের মহুয়ার মাদকতা এক ও অদ্বিতীয় ।এটাই স্বাভাবিক। পৃথিবীর যত রং আছে প্রতিটি কে যদি সমান অনুপাতে মেশানো যায় তারা ধবল সাগর গড়ে তোলে ।কিন্তু সেই ধবল

সাগর থেকে প্রত্যেকটি রং কে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া বড়ো কঠিন। মানব চক্ষুর পক্ষে এই কাজ জটিলহয়ে ওঠে। এই চোখ বৈচিত্রের মধ্যে এককে প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু একের মধ্যে বৈচিত্র কে প্রত্যক্ষ করতে গেলে চশমা লাগাতে হয়। যখন চশমা অমিল হয় তখনই যত সমস্যা উড়ে এসে জুড়ে বসে।
তাই সমাজ যখন চশমা হারাতে শুরু করে তার জটিলতা তত বৃদ্ধি পায়। চোখের পাওয়ার বাড়লে মানুষ চশমা পরে। তখন বুঝতে হবে সমাজেরও চোখে পাওয়ার
বাড়ছে। আমাদের প্রথম দেখতে হবে এই পাওয়ার বেড়ে যাওয়ার কারণ কি।

পাশ্চাত্য দর্শনের দুটি প্রধান শাখা পৃথিবীর ইতিহাসে একসময় ঝড় তুলেছিল। বুদ্ধিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদ ।
প্রত্যেকেই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য পৃথক পৃথক মতবাদ স্থাপন করেছিল। বুদ্ধিবাদীরা কেবল বুদ্ধিকেই অপরপক্ষে অভিজ্ঞতাবাদীরা কেবল অভিজ্ঞতাকেই অন্ধের যষ্ঠী রূপে দেখতে শুরু করেছিলেন। সেদিন সাধারণ মানুষ হতচকিত হয়ে উঠেছিল এই দ্বি -মতবাদের টানাপড়েনে ।
ফলে সমাজের চোখের পাওয়ার বাড়তে শুরু করেছিল। প্রত্যেকেই একজন দক্ষচক্ষু বিশেষজ্ঞের খোঁজ

করছিলেন। কালের আহবানে এই বিশেষজ্ঞের উপস্থিতি ঘটেছে ।ইনি জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট যিনি বলেছিলেন বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা এই দুয়েরই সমানভাবে প্রয়োজন আছে। প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল কান্টের বিচারবাদ। অর্থাৎ আমাদের বিচার করে বুঝতে হবে সময় ও পরিস্থিতি আনুজায়ী কনটা কতটা প্রয়োজন ।
যখন কোন সমাজ ক্রান্তিলগ্নে উপস্থিত হয় তখনই তার এরূপ অবস্থা ঘটে। সে আর একের মধ্যে বহু কে দেখতে পায় না।

এখন প্রশ্ন হবে কেমন করে এমন হয়। তার জন্য আমাদের কিছু

চিত্রের মাধ্যমে বিষয়টি উপলব্ধি করতে হবে।

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা রিং কাপে পরিণত হয়েছে অথবা পাশের ছবিটাতে শুঁয়োপোকা প্রজাপতিতে পরিণত হচ্ছে। আপেক্ষিকভাবে রিং কাপ দুটো পৃথক বস্তু কিন্তু এই রিং এর মধ্যেই কাপ তৈরি হওয়ার শক্তি নিহিত আছে। একইভাবে শুঁয়োপোকার মধ্যেও প্রজাপতিতে পরিণত হওয়ার শক্তি বিরাজমান। আমরা সামাজিক মানুষ এই সূক্ষ্ম পরিবর্তনকে চোখে আনতে পারি না।

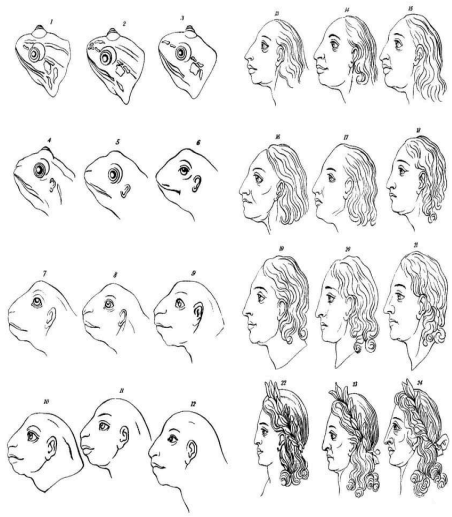

ওপরের এই ছবিতেও আমরা যদি কোন একটা নির্দিষ্ট অংশের একটা রূপকে দেখি তাবে সম্পূর্ণ ক্রমটাকে উপলব্ধি করতে পারবো না। তাই সম্পূর্ণ বিষয়টা বুঝতে গেলে আমাদের অনুপুঙ্খ ভাবে সবটাই দেখতে হবে ।তবেই একের মধ্যে বহুকে অর্থাৎ ২৪ নম্বর ছবির মধ্যে পূর্বের ২৩ টি সম্ভাবনাকে প্রত্যক্ষ করতে পারব।

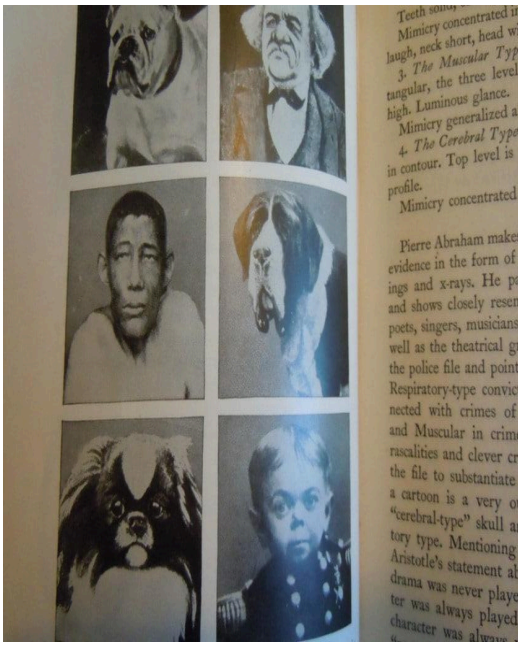

এই ছবিটিতে আমাদের আলোচনা বাস্তব রূপ লাভ করেছে। যদি শুধু কুকুরগুলোর মুখ আমরা দেখি তবে মনে হবে যে তাদের মুখের ছাপ কেবলমাত্র ওদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু ছবি বলছে ওই একই মুখের ছাপ একটি আলাদা প্রাণীর মুখের রূপ নিয়েছে। আসলে নৃতত্ত্বকে কখনো ঢাকা দিয়ে রাখা যায় না। এর মৃত্যু নেই।

এতক্ষণের আলোচনার ব্যবহারিক রূপ–

১. ফোকলোরের আবির্ভাব :
প্রাণীদের বিবর্তনের ধারার মধ্যবর্তী স্তরের কোন একটি অংশের মধ্যে মিশ্র রূপ আমরা লক্ষ্য করছি। এখান থেকেই জন্ম হচ্ছে খিচুড়ি প্রাণীর (হাঁশজারু/বকচ্ছপ)যা ফোকলোরের মৌলিক ও প্রাথমিক উপাদান রূপে বিবেচিত হয়।

২. সম্ভাবনা তত্ত্বের উৎপত্তি :
এই বিবর্তনের ধারার কোন একটি নির্দিষ্ট অংশকে ধরে, ওই বিবর্তনের পূর্ববর্তী গঠনকে দেখে, আমরা অন্তিম অংশের সম্ভাবনার কথা ভাবতে পারি।

৩. তুলনামূলক তাত্ত্বিক আলোচনার আবির্ভাব:
এর থেকে এক তুলনামূলক পদ্ধতি পাওয়া যাচ্ছে যা গ্রহণ করেছে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব এবং যা পরবর্তীকালে কাজে লাগিয়েছে তুলনামূলক লোকসংস্কৃতি বিদ্যা এবং তুলনামূলক সাংস্কৃতিক আলোচনা।

৪. রূপক তত্ত্বের বিকাশ :
এখানে আমরা একটা সম্ভাবনা দেখে অপর একটা সম্ভাবনার কথা আসা করি যে কারণে আমাদের অনেক গুলি স্তর অতিক্রম করতে হয়। যার ফলে আবির্ভাব হচ্ছে রূপকের, যা পরবর্তীকালে সাহিত্যের ব্যঞ্জনার মূল প্রাণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

৫.কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উৎপত্তি:
প্রত্যেকটি অঞ্চলের একটি নিজস্ব ভাব থাকে।যে ভাব সেই অঞ্চলেরই মানুষের ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত হয় এবং এর ভিত্তিতেই পৃথক অঞ্চল অনুযায়ী পৃথক পৃথক সংস্কৃতির জন্ম হয়। বস্তুবাদ পরিণত হয় প্রাণবাদে যা যন্ত্রেরও মন তৈরি করতে বা রোবটে হৃদয়ের আবির্ভাব ঘটাতে সাহায্য করে।

এর থেকেই আমরা বুঝতে পারছি সংস্কৃতি কখনো ধার নিতে হয় না। একটা নির্দিষ্ট পরিস্থিতি দুটো

অপরিচিত গোষ্ঠীর মধ্যে সাদৃশ্য যুক্ত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলে।
যেমন-প্রাচীন প্রস্তর যুগে দক্ষিণ ভারতের আদিম মানুষ যে হাতিয়ার ব্যবহার করত বহু দূরের উত্তর ভারতের আদি মানবগোষ্ঠীকেও সেই একি ধরণের হাতিয়ার ব্যবহার করতে দেখা যায়। যদিও এই দুই আদিম গোষ্ঠী কাউকে চিনত না।
(যা এখানে কুকুর ও মানুষের মধ্যে ঘটেছে ।)

আবার কখনো কখনো সাংস্কৃতিক উপাদানের বিনিময়ের মাধ্যমেও সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য গড়ে উঠতে পারে।
যেমন-জার্মানির গ্রিম ভাতৃদ্বয় এর মতে ,প্রাচীন ফোকলোর গুলির উৎপত্তি এশিয়া মাইনোর অঞ্চলে এবং পরবর্তীকালে যা সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে ।এই বিষয় আমরা দেখতে পাই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সাহিত্যে ছোট গল্প' নামক প্রবন্ধে।
এই দুই তত্ত্ব ঠিক যেন বুদ্ধিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদের সঙ্গে তুলনীয়।

এই দুই তত্ত্বকেই মানুষ পরিস্থিতি অনুযায়ী কিভাবে গ্রহণ করবে বুঝে উঠতে পারছে না ,তাই আজ এক নতুন বিচারবাদের প্রয়োজন,যা এই জরাগ্রস্থ, মৃত্যু পথগামী সমাজকে মৃত্যুঞ্জয় করে তুলবে।

- গ্রন্থঋণ

1. Horold M.Holden: “NOSE”; The World Publishing Company

2.J.C Lavater:Essays on animality

3. রওশন জাহিদ : "তুলনামূলক ফোকলোর " সৃজনি প্রকাশনী ,বাংলাদেশ

4. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : “সাহিত্যে ছোটগল্প “;মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স